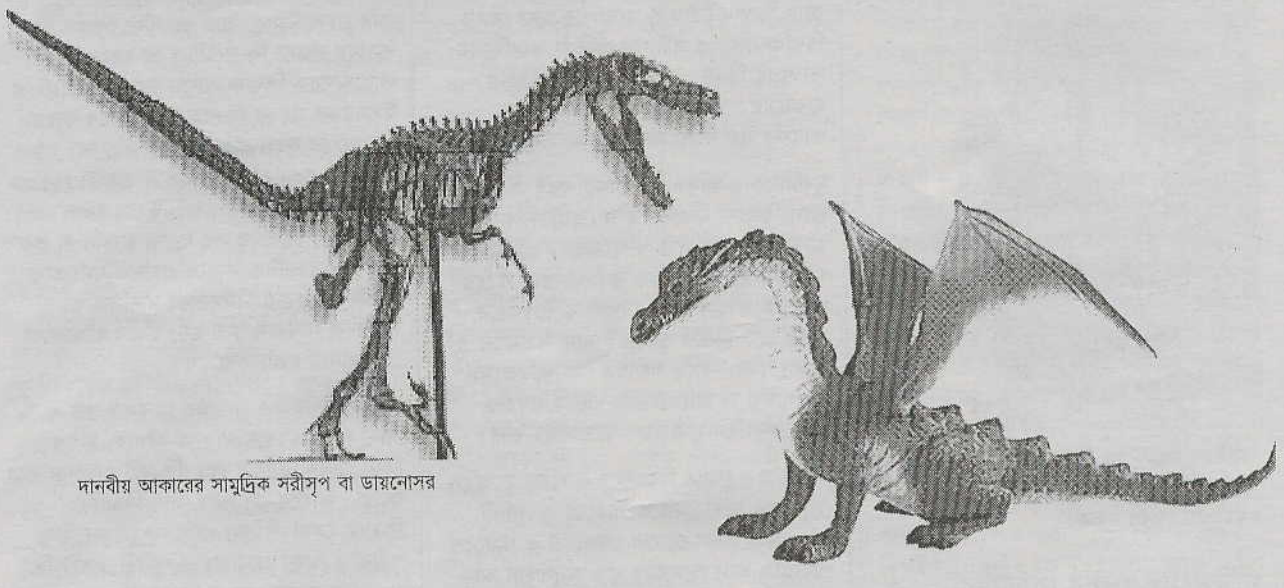

দানবীয় আকারের সামুদ্রিক সরীসৃপ বা ডায়নোসর

# ফসিল এবং প্রাচীন উপকথা

বন্যা আহমেদ

ভূতত্ত্ববিদ এবং ফসিলবিদরা আঠারশো শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ফসিলগুলো আসলে কি তা বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝতে শুরু করলেও চার্লস ডারউইনই প্রথম ১৮৫৯ সালে একে বিবর্তনের আলোয় সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেন।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ফসিলের অস্তিত্ব জেনে আসলেও এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছে মাত্র সেদিন - কয়েক শো বছর আগে। ৩৮০ কোটি বছর আগে সৃষ্টির এক ঊষালগ্নে প্রাণের যে যাত্রার সূচনা হয়েছিল তা আর থমকে দাঁড়ায়নি এক মুহূর্তের জন্যও। কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের পথ ধরে সরলতম প্রাণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে আজকের এ নিরন্তর প্রাণের মেলা; বৈচিত্র্যে, বিস্তৃতিতে, বিন্যাসে, হাজারো প্রাণের সমারোহে এর তুলনা পাওয়া ভার। আর এ সুদীর্ঘ যাত্রাপথে সে ফেলে এসেছে তার পথ চলার বিভিন্ন ধরনের সাক্ষ্য, যদিও তার অর্থ বুঝতে আমাদের লেগে গেছে এতগুলো শতাব্দী। এদের মধ্যে ফসিল হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফসিল রেকর্ড থেকেই আমরা পৃথিবীতে প্রাণের বিবর্তনের সরাসরি সাক্ষ্য খুঁজে পাই। ভূতত্ত্ববিদ এবং ফসিলবিদরা আঠারশো শতাব্দীর শেষদিক থেকে ফসিলগুলো আসলে কি তা বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝতে শুরু করলেও চার্লস ডারউইনই প্রথম ১৮৫৯ সালে একে বিবর্তনের আলোয় সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেন। জেনেটিক্স, জিনোমিক্স এবং অণুজীববিদ্যার অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে আজকে জীবের ডিএনএ থেকেই বিবর্তনবাদের মূল তত্ত্বকে প্রমাণ করা গেলেও কয়েক দশক আগেও কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম ছিল না। আমরা তো ডিএনএর খবর জানলাম মাত্র আধা শতাব্দী আগে (১৯৫৩ সালে), জিন বলে যে একটা কিছু আছে তাও জানতে পেরেছি মাত্র এক শতাব্দী আগে (মেন্ডেলের আবিষ্কার সম্পর্কে পৃথিবী জানতে পারে ১৯০০ সালে)! তার অনেক আগেই প্রজাতি যে স্থির নয়, কিংবা ধরুন পৃথিবীর বয়স যে আসলে বাইবেলে বলে যাওয়া ৬ হাজার বছরের চেয়ে অনেক বেশি, অথবা সবগুলো মহাদেশ যে একসময় একসাথে ছিলো এ ধরনের কিছু মৌলিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পিছনে ফসিল রেকর্ড আক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সে সময় ফসিল রেকর্ডগুলো না থাকলে ডারউইনের দেওয়া বিবর্তনবাদ তত্ত্ব বা আলফ্রেড ওয়েজেনারের মহাদেশীয় সঞ্চরণের মত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলো আমরা পেতাম কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। এখন অনেক গবেষক আবার বলছেন, শুধু বিজ্ঞানের অঙ্গনেই নয়, আমাদের পূর্বপুরুষের এ ফসিলগুলোর নাকি অভূতপূর্ব অবদান রয়েছে আমাদের প্রাচীন লোককাহিনী, বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক ভুবনেও!

দানবীয় আকারের সামুদ্রিক সরীসৃপ বা ডাইনোসর জাতীয় বিভিন্ন প্রাণীর ফসিলের ধ্বংসাবশেষ দেখেই প্রাচীন আমলের মানুষেরা হয়তো অনেক ধরনের কল্পকাহিনী বা মিথের জন্ম দিয়েছিল। লোককাহিনীর গবেষক আড্রিয়ানা মেয়র (Adrienne Mayor, 2000)-এর লেখা The First's Fossil Hunters বা প্রথম ফসিল শিকারিরা বইটা সম্প্রতি ভূতত্ত্ববিদ্যার অঙ্গনে সাড়া ফেলে দিয়েছে। একটার পর একটা উদাহরণ টেনে, বিভিন্ন ধরনের লোকজ গল্পে অবলম্বনে তৈরি প্রাচীন ছবি বা ভাস্কর্যের সাথে বিভিন্ন ফসিলের তুলনা করে, আড্রিয়ানা অত্যন্ত চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন যে, আজকে আমরা যেসব মিথের কথা শুনি তার অনেকগুলোরই ভিত্তি হয়তো লুকিয়ে রয়েছে ফসিলের মধ্যেই। প্রাচীন আমলের মানুষ দৈত্যাকৃতি সব আদি প্রাণীদের হাড় বা ফসলি দেখে শুধু যে আতঙ্কিত হয়েছে তাই-ই নয়, নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে ত্রাস আর বিহ্বলতার মেলবন্ধনে সে সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন রূপকথার, এমনকি কখনো অজানা শ্রদ্ধায় তাদের স্থান করে দিয়েছে পূজার

বেদীতে। ফসিল রেকর্ড নিয়ে গুরুগম্ভীর বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ঢোকার আগে মানব সভ্যতার ইতিহাসের পাতার এ মজার অধ্যায়টিতে একটু চোখ বুলিয়ে নিলে বোধ হয় মন্দ হয় না। বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করলে ফসিলবিদ্যার ইতিহাস কিন্তু খুব বেশিদিনের নয়, সাধারণভাবে মাত্র ২০০ বছর আগের ফরাসি প্রকৃতিবিদ জর্জ কুভিয়েকে (Georges Cuvier, 1769-1832)-এর জনক বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু আড্রিয়ানা ফসিলবিদ্যা চর্চার সেই সময় সীমাটাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন কয়েক হাজার বছরের বিস্তৃতিতে। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ জন বোর্ডম্যানের মতে, আড্রিয়ানাই প্রথমবারের মতো ধারাবাহিকভাবে ফসিলের সাথে প্রাচীন মিথগুলো সম্পর্ক স্থাপন করে তাদেরকে নতুন করে অর্থবহ করে তুলেছেন আমাদের সামনে।

প্রাচীন গ্রিক, রোমানসহ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন সভ্যতাগুলো প্রাচীনকাল থেকেই ফসিল সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ এবং সংরক্ষণ পর্যন্ত করেছে, আর স্বভাবতই তাদের তদানীন্তন জ্ঞানের আলোয় মিলিয়ে এগুলোর ব্যাখ্যা দেয়ারও চেষ্টা করেছে। সেখান থেকেই হয়তো সৃষ্টি হয়েছে নানাধরনের মিথের, সৃষ্টি হয়েছে মহাপরাক্রমশালী মহানায়ক থেকে শুরু করে ভয়ঙ্করী সর্পরাজ কিংবা সাইক্লোপের মতো এক চোখা বিশালদেহী দৈত্যর। প্রাচীন গ্রিকরা যে প্রাচীন দৈত্যাকৃতি জিরাফ, ম্যামথ বা মাসটাডোনের মতো বিলুপ্ত অতিকায় হাতির ফসিলের সংস্পর্শে এসেছিলেন ইতিহাসে তার ভুড়িভুড়ি প্রমাণ পাওয়া যায়।

আড্রিয়ানা গ্রিস এবং তার আশে-পাশের অঞ্চলের প্রাচীন ধ্রুপদ্য লোককাহিনীর লিজেন্ড গ্রিফিনের সাথে অদ্ভুত সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন প্রোটোসেরাটপ নামে প্রাচীন এক ডাইনোসরের ফসিলের। আসলে গ্রিফিস কোনো গ্রিক বা রোমান লিজেন্ড নয়।

শোনা যায় খ্রস্টপূর্ব ৭০০-৬০০ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ার সাইথিয়ান নামের এক যাযাবর জাতি থেকে গ্রীক পর্যটক অ্যারিস্টিয়াস প্রথম এ গ্রিফিনের কথা জানতে পারেন। সে অর্ধেক পাখি, অর্ধেক সিংহ, তার শরীর সিংহের মতো, মুখের আকৃতি ঈগলের মতো, আর তার ছড়ানো পাঁজরের সাথে কল্পনার রং মিলিয়ে জুড়ে দেয়া হয়েছে পাখির ডানা। সিংহ এবং ঈগলের শক্তিতে বলীয়ান দুর্ধর্ষ এ গ্রিফিন নাকি সেখানকার সোনার খনিগুলোকে পাহারা দেয়! পরবর্তীতে অ্যারিস্টিয়াসের লেখা গল্পে দেখা যায় মানুষ ঘোড়ায় চড়ে এ গ্রিফিনদের সাথে যুদ্ধ করছে সোনার খনিগুলো ছিনিয়ে নেয়ার জন্য। কিন্তু এদিকে আবার ফসিল রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীর বুকে চড়ে বেড়ানো প্রোটোসেরাটপ নামে ডাইনোসরেরও মুখটা ছিল অনেকটা পাখির ঠোঁটের মতো, পাগুলো ছিলো পাখির পায়ের মতোই সরু সরু। অবাক না হয়ে পারা যায় না যখন শুনি ডাইনোসরেরাই ছিল আজকের যুগের আধুনিক পাখিদের পূর্বপুরুষ। অনেকদিন আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা ধারণাটি করে থাকলেও সম্প্রতি চীনে পাওয়া বেশকিছু মধ্যবর্তী ফসিল থেকে তারা আরও নিশ্চিতভাবে প্রমাণ পেয়েছেন যে, এক ধরনের ডাইনোসর থেকেই আসলে পাখির বিবর্তন ঘটেছে। প্রোটোসেরাটপের ফসিলের সাথে এ লিন্ডে গ্রিফিনের উড়ন্ত ছবি এবং পাশে রাখা প্রাচীন একটি গ্রিফিনের একটি মূর্তির মধ্যে এত মিল দেখে যে কেউই হয়তো অবাক হবেন। প্রাচীন লোককাহিনীতে শোনা যায়, মহাপরাক্রমশীল রোমান সেনাপতি কুইন্টাস সারটোরিয়াস মরক্কো দেশের প্রাচীন শহর টিঙ্গিসে পৌঁছলে সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা তাকে কুখ্যাত রাক্ষস অ্যান্টিয়াসের কবর দেখাতে নিয়ে যায়। সারটোরিয়াস নাকি ৮৫ ফুট দীর্ঘ এ কঙ্কাল দেখে এতই ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, সে আবার নিজের হাতে শ্রদ্ধাভরে তাকে দাফন করার ব্যবস্থা করে দেয়।

অ্যান্টিয়াস গ্রিক পুরাণে একজন সহিংস রাক্ষস, যাকে পরে মহাবীর হারকিউলিস হত্যা করে মানবজাতিকে রক্ষা করেন! অনেকে মনে করেন যে, বিশালাকার এক আদিম হাতি অ্যানানকাস (Teralophodon Longirostris, Anancus)-এর ফসিল ছাড়া হয়ত এটি আর কিছুই ছিলো না। কুভিয়ের মতে, অনেক সময়ই স্থানীয় লোকেরা হঠাৎ করে খুঁজে পাওয়া ফসিলগুলোর আকারকে ৮-১০ গুণ হারে অতিরঞ্জিত করে এ ধরনের বিভিন্ন রূপকাহিনীর জন্ম দিত। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ অঞ্চলের এ ধরনের প্রাচীন হাতি, ম্যামথ (M. Africnvus) বা দৈত্যাকার জিরাফ থেকে শুরু করে প্রাগৈতিহাসিক ইওসিন যুগের বিশাল তিমি মাছের (Eocene Whales) ফসিলের ছড়াছড়ি দেখা যায়, যাদের কারও কারও হাড়ের দৈর্ঘ্য আবার ৭০ ফুট পর্যন্ত লম্বা ছিল! এখান থেকে মাত্র ১৫০ মাইল দুরে অ্যাটলাস পাহাড়েই বিস্ময়কর রকমের বড় আকারের ডাইনোসরের কিছু ফসিল পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি গ্রিসের নিকটবর্তী ঐতিহাসিক ক্রিট দ্বীপে (এ ক্রিট দ্বীপের সাথেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা মহেঞ্জোদারোর বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল বলে ধারণা করা হয়) খুঁজে পেয়েছেন আদিম দানবাকৃতি হাতি Deinotherium Giganteum-এর ফসিল। এ প্রকাণ্ড ১৫ ফুট লম্বা, সাড়ে চার ফুট দাঁতওয়ালা স্তন্যপায়ী প্রাণীটিকে আজকের আধুনিক হাতিদের দুর সম্পর্কের খালাতো ভাই হিসেবে ধরা যেতে পারে। সৃষ্টির আদি থেকে এখন পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়ানো বিশালতম প্রাণীদের মধ্যে এরা অন্যতম। আজকের যুগের বিজ্ঞানীরা যখন মাথার মাঝখানে বিশাল গোলাকৃতি গর্তসহ এদের মাথার খুলির ফসিল খুঁজে পান তখন তারা বহু

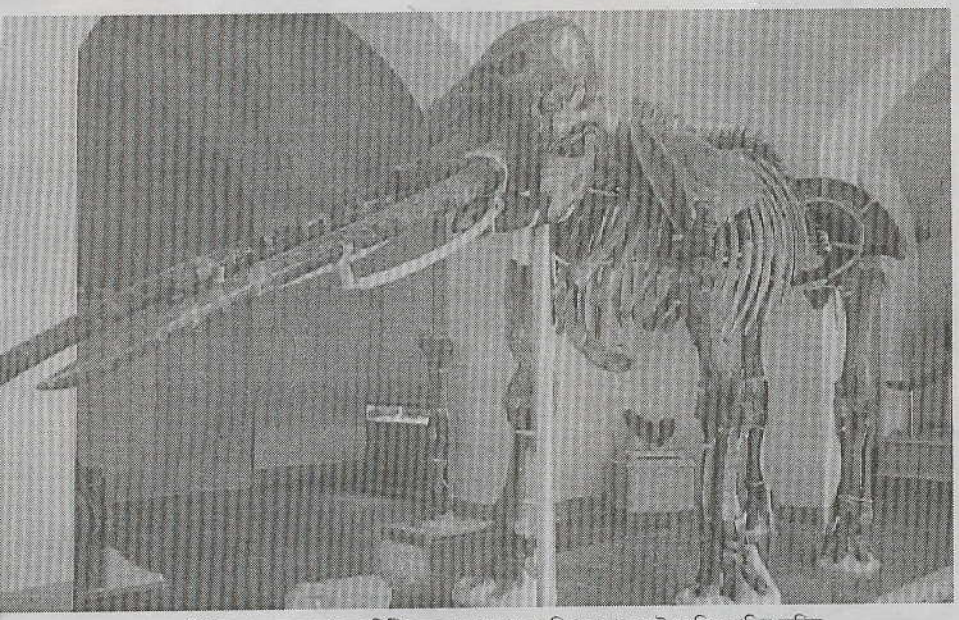

ফ্লোরেন্স মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রিতে অ্যানানকাস বা বিশালাকার সেই আদিম হাতির ফসিল

সারটোরিয়াস নাকি ৮৫ ফুট দীর্ঘ অ্যান্টিয়াসে কঙ্কাল দেখে এতই ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, সে তাকে আবার নিজের হাতে শ্রদ্ধাভরে তাকে দাফনের ব্যবস্থা করে দেয় গ্রিক পুরাণে একজন সহিংস রাক্ষস, যাকে পরে মহাবীর হারকিউলিস হত্যা করে মানবজাতিকে রক্ষা করেন! অনেকে মনে করেন বিশালাকার এক আদিম হাতি অ্যানানকাসের ফসিল ছাড়া হয়তো এটি আর কিছুই ছিল না।

অভিজ্ঞতার আলোকে ধরে নেন যে, এখানে নিশ্চয়ই লম্বা একটা শুঁড়ই ছিল। কিন্তু ভেবে দেখুন তো কয়েক হাজার বছর আগের আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা – পাহাড়ের গায়ে, নদীর পাড়ে বা মাটি খুঁড়ে ভাঙাচোরা, আংশিক ফসিলগুলোর হাড়গোড়ের মধ্যে হঠাৎ করে এ ধরনের একটা দানবীয় মাথা ফুঁড়ে বেরোলে এমনিতেই তো তাদের চমকে ওঠার কথা, তার উপরে আবার যদি দেখা যায় সেই মাথার মাঝখানে এক বিশালকার গর্ত, তাহলে তাকে একচোখা রাক্ষস হিসেবে কল্পনা করা ছাড়া আর কিইবা উপায় খোলা থাকে তাদের সামনে? গ্রিক মিথলজি ভয়ানক মানুষ খেকো একচোখা দৈত্য সাইক্লোপের উৎপত্তি যদি এখান থেকেই ঘটে থাকে তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। আমরা প্রাচীন কাব্যকার হোমারের গল্পেও এ একচোখা দৈত্য সাইক্লোপের কথা শুনতে পাই। ক্রিট দ্বীপের আশেপাশের এলাকায় অনেক বিশাল বিশাল আদিম প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে। তাই অনেক গবেষক মনে করেন যে, এ অঞ্চলে তৈরি হওয়া মিথগুলোর সাথে হয়তো এদের একটা সম্পর্ক ছিল।

ড্রাগনের অস্তিত্ব দেখা যায় পৃথিবীর অনেক দেশের রূপকথায়ই, তবে চীন দেশের রং বেরংয়ের, মুখ থেকে আগুনের ফুলকি ছোটানো, বিভিন্ন ধরনের ড্রাগনের গল্পই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি শোনা যায়। দুই হাজার বছরেরও আগে খ্রিস্ট পূর্ব ৩০০ শতাব্দীতে চ্যাং কুর লেখায় আমরা যে ড্রাগনের হাড় খুঁজে পাওয়ার গল্প শুনি তাও মনে হয় ডাইনোসরের ফসিলই ছিল। পাশাপাশি রাখা ডাইনোসরের ফসিল এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের কল্পনার তুলিতে বানানো ড্রাগনের মধ্যে মিল দেখে এরকম সন্দেহ জাগাটাই বোধ হয় স্বাভাবিক। এমনকি মধ্যযুগেও চীন থেকে শুরু করে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় দাঁতের ফসিল গুড়া করে সর্বরোগের নিয়ামক হিসেবে ওষুধ বানানোর রেওয়াজ ছিল। ইউরোপে মনে করা হতো যে, এ ফসিলগুলো নূহের প্লাবনে ভেসে যাওয়া মৃত প্রাণীদের ধ্বংসাবশেষ।

অনেকেই ধারণা করেন যে, ভূমধ্যসাগরীয় এবং মধ্যপ্রাচীয় অঞ্চলে বিভিন্ন সামুদ্রিক ফসিল পাওয়া যেতো বলেই প্রাচীনকালে সেখানকার মানুষের মনে মহাপ্লাবনের ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে যায়। তারা বিশ্বাস করতো একসময় নিশ্চয়ই সমগ্র পৃথিবীটাই পানির নিচে ডুবে গিয়েছিল, না হলে পাহাড়ের উপরে উচ্চভূমির পাথরের বুকে কেন এত সামুদ্রিক প্রাণীর ধ্বংসাবশেষ বা ফসিল খুঁজে পাওয়া যাবে! আর সেখান থেকেই শুরু হয় নূহের মহাপ্লাবনের কল্পকাহিনী। এখন আমরা আধুনিক ভূতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে বুঝতে পারছি যে, বিভিন্ন সময়ে জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রের পানির লেভেল ওঠানামা করলেও এ ধরনের পৃথিবীব্যাপী মহাপ্লাবন আসলে কখনোই ঘটেনি। তবে অবাক করা কাণ্ড হচ্ছে, প্রথমবারের মতো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ নূহের

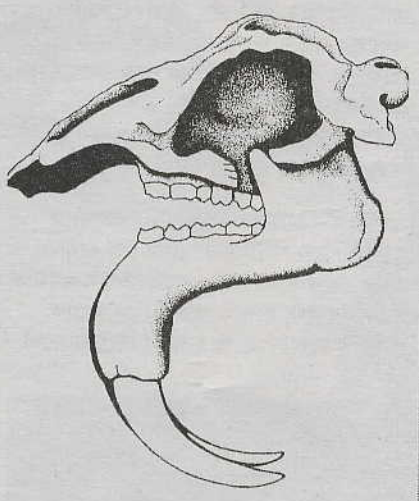

বহুদিনের প্রচেষ্টায়, বহুজনের সম্মিলিত সাধনায় আমাদের মস্তিষ্কের কোষে কোষে জমে থাকা প্রাচীন মিথগুলো ভেঙেছে। একজন দুজন বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় এটি হয় নি, এর পেছনে রয়েছে অসংখ্য সংশয়বাদী বৈজ্ঞানিক মননের অবদান।

মহাপ্লাবনের ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করে দেন যে ব্যক্তি তিনি আর কেউ নন আমাদের সেই বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। হ্যাঁ, মোনালিসার চিত্রকর ভিঞ্চিকে আমরা সাধারণত একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হিসেবে গণ্য করলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তার বহুমুখী প্রতিভার কথা সর্বজনবিদিত।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির জীবনীকার জর্জিও ভাসারি তার বহুমুখী প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন, 'তার এতই বিরল ধরনের প্রতিভা ছিল যে, তিনি যাতেই মনোনিবেশ করতেন তাতেই পাণ্ডিত্য অর্জন করে ফেলতেন। তিনি এতদিকে তার প্রতিভার উন্মেষ না ঘটালো হয়তো একজন সেরা বৈজ্ঞানিক হতে পারতেন।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি সেই পনেরশো শতাব্দীতে যে বিজ্ঞানমস্কতার পরিচয় দিয়েছিলেন ইতিহাসে তার জুড়ি মেলা ভার। তিনি নিজে ইতালির মিলান শহরের সরকারি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, কিন্তু তার প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায় ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে চিত্রকলা, শারীর-বিদ্যা, প্রানিবিদ্যা, ভূগোল, জ্যোতিবিদ্যা এমনকি ফসিলবিদ্যা পর্যন্ত। তিনিই বোধ হয় প্রথম আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ফসিলের ব্যাখ্যা দেন। ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করার সময় তাকে প্রায়ই পাহাড়ের গা কেটে সুরঙ্গ বা রাস্তা বানাতে হত। তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাহাড়ের স্তরীভূত শীলাগুলো বিভিন্ন সময়ের তলানি থেকে সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন স্তরের জন্ম দিয়েছে, তাই আমরা সবসময়ই পাহাড়ের গায়ে বা মাটিতে বিভিন্ন স্তর বা Strata দেখতে পাই। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, তিনি সে সময়ই স্তরের পর্যায়ক্রম বা Superposition-এর ব্যাপারগুলো বুঝতে পেরেছিলেন, যার ব্যাখ্যা পেতে পেতে আমাদের আরও প্রায় দুশো বছর লেগে গিয়েছিল! ১৬৬৯ সালে ড্যানিশ বিজ্ঞানী নিকোলাস স্টেন প্রথম Superposition সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করেন। স্তরীভূত পাললিক শিলার সবচেয়ে নিচের স্তরটা হচ্ছে সবচেয়ে পুরনো, আর তার উপর ক্রমান্বয়িকভাবে একটার পর একটা স্তর তৈরি হয়েছে, তাই স্তরে স্তরে খুঁজে পাওয়া ফসিলগুলো থেকে আমরা বিভিন্ন যুগের জীবদের অস্তিত্ব কিংবা বিলুপ্তির ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারি। ভিঞ্চি বুঝেছিলেন যে, ফসিলগুলো আসলে পৃথিবীর আদিম জীবদের নিদর্শন এবং পাহাড়ের গায়ে যে সামুদ্রিক সব প্রাণীর ফসিল দেখা যাচ্ছে তার কারণ আর কিছুই নয়, একসময় আসলে এ পাহাড়গুলো সমুদ্রের নিচে ছিল। তবে বিশ্বব্যাপী প্লাবনের ধারণাটার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তাকেই প্রথম আমরা বলতে শুনি যে, বিশ্বব্যাপী নূহের প্লাবনের কাহিনীটা একটা অসম্ভব ঘটনা, সারা পৃথিবীই যদি পানির নিচে ডুবে যাবে তাহলে এ পরিমাণ পানি সরে গেল কোথায়। আর এ ফসিলগুলো কোনোভাবেই বন্যায় ভেসে যাওয়া প্রাণীদের দেহাবশেষ হতে পারে না, কারণ সব কিছু বানের জলে ভেসে গেলে তাদের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কথা, তারা এভাবে সুগঠিতভাবে মাটির স্তরে স্তরে সাজানো থাকতে পারতো না।

এভাবেই আসলে বহুদিনের প্রচেষ্টায়, বহুজনের সম্মিলিত সাধনায় আমাদের মস্তিষ্কের কোষে কোষে জমে থাকা প্রাচীন মিথগুলো ভেঙেছে: তা সে নূহের প্লাবনই হোক, অথবা ছ'হাজার বছরের পৃথিবীই হোক, অথবা হোক না প্রজাতির স্থিরতায় আস্থা। একজন-দুজন বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় এটা হয়নি, এর পিছনে রয়েছে অসংখ্য সংশয়বাদী বৈজ্ঞানিক মননের অবদান। ভিঞ্চি তো আছেনই, সেই সাথে আরো আছেন উইলিয়াম স্মিথ, কুভিয়ে, জেমস হার্টন, চার্লস লায়েল, অ্যালফ্রেড ওয়ালেস আর চার্লস ডারউইনসহ অনেকেই। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই আমরা ধর্মীয় কুসংস্কার আর নানা পদের অপবিশ্বাসের কুয়াশা ভেদ করে এ পৃথিবীতে প্রাণের এ যে বিপুল সমারোহ আর তার বিকাশের এত আয়োজন তা বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছি।

*লেখক: বিজ্ঞান লেখক, আমেরিকার আটলান্টায় কর্মরত*